নথি–ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের বিভিন্ন দিক

সৈয়দ শামসুল আলম

ভূমিকা

১.১. বর্তমান বিশ্বে সকল দেশের সরকারের কার্য পরিধি বিস্তারের সংগে সংগে প্রশাসন ব্যবস্থাকে গতিশীল ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে অফিস আদালতে নথির সংখ্যা আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক দেশেই নথি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের বিষয়টি উত্তরোত্তর গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। এজন্য ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞানে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে দৈনন্দিন দাপ্তরিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে নিজস্ব ভবন, আসবাবপত্র ও কর্মকর্তা/কর্মচারী, যেমন অপরিহার্য হিসাবে বিবেচিত, তেমনি সেই প্রতিষ্ঠানের যে সকল দাপ্তরিক কাজের আদেশ, নির্দেশ, মতামত ও সিদ্ধান্ত সমুহ পত্রের মাধ্যমে লিখিত ভাবে নথিতে লিপিবদ্ধ করা হয় তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

১.২. বাংলাদেশে সরকারী প্রতিষ্ঠান সমুহে নথি–পত্রাদির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে পদ্ধতি চালু থাকলেও দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা পরিবর্ধন, পরিমার্জন এবং উন্নয়নের অবকাশ রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের নথি ব্যবস্থাপনা ও তার উন্নয়নের বিভিন্ন দিক আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রথমে নথি পত্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সরকার প্রবর্তিত দু'টি ম্যানুয়াল/পুস্তক "বেঙ্গল রেকর্ড ম্যানুয়াল ১৯৪৩" এর এবং "সচিবালয় নির্দেশমালা ১৯৭৬"এর প্রধান নির্দেশসমুহের বাস্তব প্রয়োগের সুবিধা অসুবিধা চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপর উক্ত চিহ্নিত বিষয়ের আলোকে সমভাব্য উন্নয়নের কথা তুলে ধরা হয়েছে এবং পরিশেষে উন্নয়নের পদক্ষেপ হিসাবে কতিপয় সুপারিশ করা হয়েছে।

নথি ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন

২.১. নথি ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে পুরাতন পদ্ধতি ''রেজিষ্ট্রি প্রণালী'' সর্বপ্রথম প্রাচীন রোমে প্রবর্তিত হয়। তখনকার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ/বিচারকগণ এই ব্যবস্থা চালু করেন। প্রাচীন কালে রোমান বিচারকগণের নিকট বিচার সম্পর্কীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নানাবিধ মামলা মকদ্দমা আসত। এই সকল মামলা মকদ্দমা যেহেতু একদিনে নিষ্পত্তি সম্ভব ছিলনা, তাই ম্যাজিষ্ট্রেটগণ তাদের সুবিধার জন্য ব্যক্তিগত নোট বা টোকা সংরক্ষণ করতেন। এরমধ্যে উক্ত মামলা-মোকদ্দমা সমূহের সাক্ষী, বাদী ও বিবাদীর বক্তব্যসহ সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত সমূহ স্থান পেত (খন্দকার মাহবুবুল করিমঃ আরকাইভ প্রশাসনঃ৮। পরবর্তীতে এই সকল নোট বা টোকার পরিমাণ এমনভাবে বেড়ে যায় যে মামলা-মোকদ্দমা সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

২.২. পাক-ভারত উপমহাদেশে নথি ব্যবস্থাপনা চালু হয় ১৮৫৪ সনে বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক রেকর্ড প্রণয়নের মাধ্যমে (পি, আর, দাস গুপ্ত ঃ ১৯৪৩)। এই রুলস প্রণয়ন হলেও সামগ্রিক ভাবে তা কিভাবে ব্যবহৃত হবে বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য ১৮৮৯ সালে বৃটিশ সরকার প্রফেসর জি,ডব্লিউ, ফরেষ্ট নামক একজন বিশেষজ্ঞকে তদানীন্তন বৈদেশিক বিভাগের নথি সমূহ পরীক্ষার জন্য দায়িত্ব প্রদান করেন (ওয়েন রাইটঃ ১৯৪৩)। প্রফেসর ফরেষ্ট তার প্রতিবেদনে সুপারিশ করেন যে, প্রশাসন সংক্রান্ত নথিপত্র/দলিল/ দস্তাবেজ একটি কেন্দ্রীয় রেকর্ড রুমে সংরক্ষণ করতে হবে। প্রস্তাবটি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং প্রফেসর ফরেষ্ট সাহেবকে উক্ত রেকর্ড সমূহের অফিসার ইনচার্জ নিয়োগ করা হয়। ফলে ১৮৯১ সনের ১১ ই মার্চ কলকাতায় ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট স্থাপিত হয় পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরের ফলে ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট সেখানে চলে যায়। এটি বর্তমানে ''দি ন্যাশনাল আরকাইভস অব ইন্ডিয়া'' নামে পরিচিত। পাক-ভারত উপমহাদেশে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে প্রাদেশিক সরকার প্রথা চালু ছিল। পরবর্তীতে প্রায় সকল প্রদেশসমূহ কম বেশী স্বায়ত্ব শাসনের আওতায় চলে আসে, ফলে প্রতিটি প্রদেশের নিজস্ব রেকর্ড রুলস প্রণীত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বেঙ্গাল-আসাম প্রদেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বেঙ্গল-আসাম, প্রদেশোধীন সকল কালেক্টরেট এবং তাদের অধীনস্ত অফিস সমূহের নথিপত্র লিখন, সংরক্ষণ এবং বিনিষ্ট করণের জন্য ১৯৪৩ সনের ২০ শে অক্টেবর ''বেঙ্গাল রেকর্ড ম্যানুয়াল'' নামে একটি নিজস্ব পুস্তক প্রণয়ন করা হয়। সেই থেকে বেঙ্গল এবং আসাম প্রদেশে সকল কালেক্টরেট এবং অধীনস্ত অফিস সমূহে নথি পত্র ব্যবস্থাপনা এই ম্যানুয়াল মোতাবেক চলে আসছে। (লো ইল্‌টিস এবং ওয়েণ রাইনঃ ১৯৬৯)।

২.৩. পাকিস্তান আমলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দপ্তরসমূহের অপ্রচলিত নথি সমূহের শ্রেণী বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা যথাক্রমে প্রাক্তণ পাকিস্তান সরকারের সংস্থাপন বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ৭০-৮১ নং নির্দেশাবলী (পৃঃ নং ৭৩-৮০) এবং প্রাক্তণ পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের সচিবালয় নির্দেশ নং ৯১-১০২ (পৃঃ নং ১০৩-১০৬) অনুযায়ী হতে থাকে। কিন্তু এই সকল নির্দেশমালা যেহেতু বিভিন্ন সময়ে জারী হয়, ফলে সকল দপ্তরে এর ব্যাপক ব্যবহার ও প্রয়োগ হয়ে উঠেনি। এজন্য পূর্ব-পাকিস্তানে সকল প্রশাসনিক দাপ্তরিক কার্যাবলী ''বেঙ্গল রেকর্ড ম্যানুয়াল'' অনুযায়ী চলতে থাকে।

২.৪. বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের প্রায় চার বৎসর পর ১৯৭৫ সালের আগষ্ট পর্যন্ত সচিবালয় থেকে জেলা পর্যায়ে পর্যন্ত নথি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিজস্ব কোন ম্যানুয়াল বা নির্দেশমালা ছিলনা। এজন্য সচিবালয় এবং জেলা পর্যায়ের সরকারী কাজকর্ম ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব এবং বিশৃংখলা দেখা দেয়। ফলে সচিবালয় দাপ্তরিক কার্য পরিচালনা দারুনভাবে ব্যাহত হতে থাকে। এই অবস্থা দূরীকরণের জন্য ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশের জন্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনার আংগিকে সচিবালয় নির্দেশমালা প্রস্তুত করার লক্ষ্যে খসড়া প্রণয়নের জন্য চার সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭৫ সালের অক্টোবর মাসে কমিটি সচিবালয় নির্দেশমালার খসড়া প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেন। ১৯৭৬ সালের ৩১ শে জানুয়ারী খসড়াটি অনুমোদিত হয় (বাংলাদেশ সচিবালয় নির্দেশমালা ১৯৭৬)।

২.৫ মন্ত্রী পরিষদ সচিবালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ ১৯৭৬ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী কার্যবিধিমালা (Rules of Business) ১৯৭৫ এর ৪ (১০) নং বিধি অনুযায়ী অনুমোদিত নির্দেশমালাটি ''সচিবালয় নির্দেশমালা-১৯৭৬'' নামে প্রকাশ করে। মন্ত্রী পরিষদ সচিবালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশমালা যথাযথ ও সতর্কতার সাথে পালনের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সবিবৃবন্দকে পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই সময় থেকে বাংলাদেশে উল্লেখিত নির্দেশমালার অনুসারে সকল মন্ত্রণালয় এবং সরকারের অধীনস্ত কালেক্টরেট ও দপ্তর সমূহে পালন করার কথা। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে স্বাধীনতার প্রায় দু'যুগ অতিবাহিত হওয়ার পরও এই নির্দেশমালা পালন ও প্রয়োগ সচিবালয়ের বাইরে হবে কিনা এই প্রশ্নটি সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট অমিমাংসিত অবস্থায় রয়ে গেছে। ফলে মাঠ পর্যায়ে অর্থাৎ সচিবালয়ের বাইরে অবস্থিত সরকারী দপ্তর এবং কালেক্টরেট সমূহে ১৯৪৩ সালের বেংগল রেকর্ড ম্যানুয়াল' বর্ণিত নির্দেশমালা চলে আসছে এবং সচিবালয়ের মধ্যে সচিবালয় নির্দেশমালা-১৯৭৬ চালু আছে। একই দেশে দাপ্তরিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দু'ধরনের নির্দেশমালা প্রতিপালন এবং অনুসরণ শুধু জটিলতার সৃষ্টি করছে তা নায় বরং দাপ্তরিক যোগাযোগ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কার্য-পরিচালনা দারুনভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

নথি ব্যবস্থাপনার প্রধান দিক সমূহঃ

৩.১. আধুনিক ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান অনুসারে নথি ব্যবস্থাপনাকে (Recond Management) ফলপ্রসূ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ অপরিহার্য (এলডারসনঃ ১৯৮৬)। সরকারী দপ্তরসমূহের মূলতঃ জনগণের সার্বিক কল্যাণের জন্য সেক্টর ভিত্তিক সেবা প্রদান ও উৎপাদন বৃদ্ধিই–প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানকে প্রথমে ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্তব্য (Duties) বন্টন নামা প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট সকলের উপর ক্ষমতা অর্পন করা হয়।

৩.২. এরূপ একটি বিজ্ঞান সম্মত সাংগঠনিক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অফিস ছোট মাঝারী এবং বড় যে কোন রকম হোক না কেন, দাপ্তরিক কাজের সুবিধার্থে ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করতে হবে। যাতে করে শাখার তত্বাবধায়ক/শাখা প্রধান/সহকারী সচিবের দায়িত্বে উক্ত শাখার কার্যাদি সম্পাদন যায়। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশ সচিবালয়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে যথাক্রমে (ক) বিভাগ, (খ) উপ–বিভাগ, (গ) ব্রাঞ্চ, এবং (ঘ) শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে।

৩.৩. পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে দপ্তরে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব বর্ণনা একটি সফল প্রতিষ্ঠানের পূর্ব শর্ত। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে সরকারী প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব বন্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক বেশী মেধা সম্পন্ন লোকবল থাকা সত্ত্বেও প্রত্যাশিত সেবা প্রদান এবং উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্র অর্জিত হয়না। এজন্য প্রতিটি সরকারী অফিসে দায়িত্ব বন্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার প্রয়োগ থাকা আবশ্যক। সরকারী অফিসে এই বিষয়টি প্রতিপালনের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, সচিবগণ তার অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষমতা বন্টনের বিষয় নির্ধারণ করবেন এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্ম সম্পাদনের প্রকৃতি ও পরিধি অনুসারে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ক্ষমতাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট স্থায়ী আদেশ জারী করবেন (সচিবালয় নির্দেশমালা–১৯৭৬ঃ৩)।

প্রাসঙ্গিক ভাবনা ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিক

৪.১ স্বাধীনতার প্রায় দু'দশক পেরিয়ে যাবার পথে অথচ এখনও দেশে নথি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দু'টি ধারা চালু রয়েছে। বাংলাদেশ সচিবালয় এর বাইরে অর্থাৎ জেলা সদর দপ্তরে অবস্থিত কালেক্টরেট সমূহে এবং উপজেলা সমূহে ১৯৪৩ সালে প্রণীত "বেংগল রেকর্ড ম্যানুয়েল" অনুসারে নথি পত্রাদি সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণ হচ্ছে। অপরদিকে

মন্ত্রণালয় সমুহে সচিবালয় নির্দেশমালা ১৯৭৬ মোতাবেক নথি পত্রাদি সংরক্ষণ করা যাচ্ছে। দু'টি ধারা প্রবর্তনের ফলে শুধু যে নথি পত্র সংরক্ষণ ও বিনষ্টকরণে অসুবিধা হচ্ছে তা নয়, বরং সরকারী অফিস সমুহে পত্রাদি লিখনেও দু'টি ধারা চালু রয়েছে। এতে একই কর্মকর্তা যখন মাঠ পর্যায়ে কর্মরত থাকছেন তখন তাকে একটি ধারায় নথি পত্রাদি সংরক্ষণ ও লিখতে হচ্ছে। আবার ঐ কর্মকর্তা যখন সচিবালয়ে ফিরে মন্ত্রণালয়ের কর্মরত থাকছেন তখন অপর একটি ধারা অনুসরণ করছেন। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে এই দু'ধারা চালু থাকার ফলে মাঠ পর্যায় থেকে মন্ত্রণালয়ে কোন ক্ষেত্রে কিরূপ পত্রাদি লিখতে হয় তা সঠিকভাবে জানা না থাকার দরুন নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে, কোন কোন কর্মকর্তা কর্মক্ষেত্রের বেশীর ভাগ সময় মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ছিলেন বলে নথি ব্যবস্থাপনার সেই পুরানো ধারাটির সাথে তিনি পরিচিত রয়েছেন। ফলে সচিবালয়ে প্রবর্তিত ধারাটির সাথে পরিচিত হবার সুযোগ আদৌ পাননি। এজন্য সচিবালয়ে কর্মরত কোন কর্মকর্তার পত্রটি ভিন্ন ধারায় লিখিত হচ্ছে। এতে করে একে অপরের প্রতি ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হচ্ছে।

৪.২. এজন্য সরকার এদিকটা চিন্তা করে সচিবালয় নির্দেশমালা-৭৬ মোতাবেক মন্ত্রণালয় থেকে মাঠ পর্যন্ত সকল সরকারী অফিসে একক ধারা প্রবর্তনের জরুরী নির্দেশ দিতে পারে। ফলে সকল সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে একক ধারা পরিচিত হবে, তেমনি নথি পত্রাদি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও সমতা বজায় থাকবে। এটা করতে হলে মাঠ পর্যায় থেকে সচিবালয় পর্য্যন্ত একটি সুষম সমন্বয় সাধন করা একান্ত অপরিহার্য।

৪.৩. সচিবালয়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, নিয়মিত সংযুক্ত দপ্তর ও অধিদপ্তর সমুহের মধ্যেও নথি ব্যবস্থাপনার ধারা একরূপ নয়। ফলে মন্ত্রণালয় বহির্ভূত অধিদপ্তর ও সংস্থা সমুহে পৃথক পৃথক ধারা বিদ্যমান রয়েছে। অথচ সরকারী পর্যায়ে সমন্বয়ের মাধ্যমে এই সকল পৃথক পৃথক ধারা পরিবর্তন করে একক ধারা প্রবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন হলে সকল সরকারী অফিসে "নথি ব্যবস্থাপনা সপ্তাহ" পালনের মাধ্যমে এই একক ব্যবস্থা/ধারা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

৪.৪. সচিবালয় নির্দেশমালায় একটি নিষ্পত্তিযোগ্য বিষয়ে পত্র টাইপ করে অনুলিপি প্রসংগে বলা আছে যে কোন পত্র ১২টির অধিক হলে ষ্টেন্সিল করে দিতে হবে। এবং ১০০টির অধিক কপি করতে হলে সরকারী মুদ্রণালয় থেকে ছাপিয়ে দিতে হবে। বর্তমানে ডুপ্লিকেটিং মেশিনের সাহায্যে শতাধিক অনুলিপি করা সম্ভব এজন্য যেক্ষেত্রে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমুহের পত্র এক হাজার কপির অধিক হলে মুদ্রণালয় থেকে ছাপানোর নির্দেশ দেওয়া এবং সে ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রতিপালন হতে পারে।

৪.৫. নথি বিনষ্ট করণ প্রসংগে যে সকল নির্দেশাবলী প্রদান করা হয়েছে। সে সকল নির্দেশাবলীর মধ্যে শাখা প্রধান ও সহকারী সচিবের দায়িত্বে পত্রাদি বিনষ্ট করণ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় শাখা প্রধান ও সহকারী সচিব একেবারে সর্ব নিম্নস্তরে অবস্থান করে। একটি মন্ত্রণালয়ের নথি পত্রাদি বাছাই ও বিনষ্ট করণের বর্তমানে প্রচলিত নির্দেশটি বাস্তবতার আলোকে কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা বিবেচনা করার অবকাশ রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। আধুনিক বিশ্বের রাষ্টসমুহে যথা–ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে প্রথার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। নথি পত্রাদি মুল্যায়ন ও বিনষ্ট করণের জন্য যুক্তরাজ্যে দ্বি–স্তর পদ্ধতি (Two stage Review System) এবং যুক্তরাষ্ট্রে অপসারণ তালিকা পদ্ধতি (Disposal Schedule System) চালু রয়েছে। বাংলাদেশেও নথি–পত্রাদি বিনষ্ট করণের জন্য অনুরূপ একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। বর্তমানে প্রচলিত এ, বি, সি, এবং ডি পদ্ধতিতে চিহ্নিত নথি সমূহ পুনঃমুল্যায়নের ব্যবস্থা করা যায় এবং ঐ সকল নথির ভবিষৎতে কোন জাতীয় বা ঐতিহাসিক প্রয়োজনে আসবে কিনা সে বিষয়টি বিবেচনা করে সকল প্রকার নথি দ্বিতীয় বার মুল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা উচিত। এই পর্য্যায়ে মুল্যায়নের সময় যখন নথিসমুহ ২৫ বৎসর বা তার চেয়ে অধিকার রাখবার প্রয়োজন রয়েছে এমন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ২৫ বৎসর কাল পর্যন্ত সচিবালয় বা পরিদপ্তরের সংরক্ষণাগারে রাখা যায় এবং ২৫ বৎসরের অধিক অর্থাৎ স্থায়ী নথিসমুহ জাতীয় আরকাইভস পাঠানো যেতে পারে। আরকাইভসে কেবল দেশের ঐতিহাসিক এবং জাতীয় প্রয়োজন আসবে এমন সব নথি যথাক্রমে সচিবালয়/পরিদপ্তর সংরক্ষণাগার থেকে স্থানান্তর করে আনা উচিত। উন্নত বিশ্বের প্রায় সকল দেশে আরকাইভস, লাইব্রেরী ও যাদুঘরে এই ধরনের সকল মুল্যবান রেকর্ড সমুহ সংরক্ষিত হচ্ছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরী অব কংগ্রেস এবং বৃটেনের বৃটিশ মিউজিয়াম ও আরকাইভস এই দায়িত্ব পালন করছে। এই নথির সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে উন্নত দেশসমুহ তাদের ঐতিহাসিক নথিপত্রাদি মাইক্রোফ্লিল্মের মাধ্যমে সংরক্ষণ করছে। বাংলাদেশে অনুরূপ প্রযুক্তির সাহায্যে ঐতিহাসিক নথি সমুহ মাইক্রোফিল্ম করে নথির সংখ্যা হ্রাস করা যেতে পারে। এমনকি কম্পিউটারের মত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় পাশ্চাত্য দেশ সমুহ যেমন বিপুল সংখ্যক নথি পত্রাদি কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে যে সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার চালু করেছেন সে সকল প্রতিষ্ঠান এই প্রযুক্তির মাধ্যমে নথিপত্রাদি সংরক্ষণ করতে পারেন।

৪.৬. দেশে জাতীয় আরকাইভস ছাড়াও অন্যান্য সংস্থায় নিজস্ব সংরক্ষণাগার গড়ে উঠতে পারে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়,আনবিক শক্তি কেন্দ্র, ব্যাংক, শিল্প ও কৃষি গবেষণাগার, বাণিজ্য সংস্থা, রেলওয়ে, সামরিক, ও আধাসামরিক দপ্তর ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য বর্তমানে দেশে প্রতিটি জেলার কালেক্টরেটে ২৫ বৎসর বা তদুর্ধ

সময়ের নথিপত্রাদি সূচীকৃত অবস্থায় পড়ে আছে। সেই সকল নথিপত্র আর বিলম্ব না করে মূল্যায়নের পর জাতীয় আরকাইভসে প্রেরণ করা উচিত।

৪.৭. সরকারী অপ্রচলিত নথিপত্র ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে আমাদের অজান্তে হয়ত এমন মূল্যবান দলিল ও নথিপত্রাদি অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। সংবাদ পাওয়া মাত্র আমাদের জাতীয় স্বার্থে এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ঐ সকল দলিল ও পত্রাদি সংগ্রহ করে জাতীয় আরকাইভসে প্রেরণ করা উচিত। এজন্য সরকারের উচিত দেশের প্রসিদ্ধ গবেষক, ঐতিহাসিক ও দলিল সংরক্ষকদের নিয়ে জাতীয় ও জেলা পর্য্যায়ে নথি সংরক্ষণ কমিশন গঠন করা।

৪.৮. এছাড়া সচিবালয় নির্দেশমালায় সংশ্লিষ্ট ধারাগুলোকেও সরল সহজ করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ কোন একটি নথি তিন বৎসর পর্যন্ত প্রশাসন ক্ষেত্রে সরাসরি প্রয়োজন না হলেও মূল্যায়ন এ বিচার করে সংগে সংগে সংরক্ষণাগারে পাঠানো যায়। অধুনা অপ্রচলিত নথিপত্রের মধ্যে কোন্‌গুলো দ্বিতীয় ও শেষ মূল্যায়নের জন্য রাখা হবে এবং কোন্‌গুলো তাৎক্ষণিকভাবে বিনষ্ট করা হবে সেটাই হলো প্রথম মূল্যায়নের উদ্দেশ্য। যেগুলো দ্বিতীয় বা শেষ মূল্যায়নের বা পুনর্বিচারের পর বাছাই রকা হলো সেগুলোকে সচিবালায় সংরক্ষণাগারে রাখা যায়। সচিবালয় সংরক্ষণাগার থেকে ঐ সকল নথির জন্ম থেকে ২৫ বৎসর পর মূল্যায়ন করে যেগুলো স্থায়ী হিসেবে রাখা দরকার সেগুলো জাতীয় আরকাইভসে পাঠানো প্রয়োজন। এজন্য সচিবালয় নির্দেশমালায় বর্ণিত মূল্যায়ন পদ্ধতির চেয়ে প্রস্তাবিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। যে নথি সংরক্ষণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সেই নথি সমুহ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির মাধ্যমে মূল্যায়ন করা বাঞ্চনীয়।

কতিপয় প্রস্তাবনা

৫.১. উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ বিবেচনা করা যেতে পারেঃ—

(ক) নথি ব্যবস্থাপনা সংরক্ষণ, বিনষ্ট করণ ও লিখনের জন্য একক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা আবশ্যক। এই ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারী পর্য্যায়ে নির্দেশ প্রদান ছাড়াও নথি ব্যবস্থাপনা সপ্তাহ উদযাপনকরা যেতে পারে।

(খ) ''সচিবালয় নির্দেশমালা–১৯৭৬'' শীর্ষক ম্যানুয়েলটি বর্তমান সময়ের চাহিদা মোতাবেক পরিমার্জন, পরিবর্তন ও সংশোধন করে সচিবালয় থেকে শুরু করে সরকারী,

আধা সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় প্রবর্তন করা যায়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে জেলা সদরের কালেক্টরেটসমূহে এবং উপজেলা পর্যায়ের অফিস সমূহ চালু করার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।

(গ) একক ধারা চালু করার জন্য নথি ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের (Institutional Traning) ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে বিপিএটিসি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে কর্মকর্তাদের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত কোর্স প্রদানের উদ্যোগ নিতে পারে। এছাড়া প্রতিটি সরকারী অফিসে নথি ব্যবস্থাপনার উপর অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের (On the Job Training) ব্যবস্থা করে এই সমস্যা অনেকাংশে কমিয়ে ফেলা যেতে পারে। কর্মচারী পর্যায়ে এই প্রশিক্ষণের জন্য আরপিএটিসি–কে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।

(ঘ) অফিস প্রশাসন ও নথি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সৃষ্ট নথি পত্রাদি একটি দেশ ও জাতীয় জীবনে মুল্যবান দলিল। এই দলিল আমাদের প্রজন্মের নিকট তুলে ধরার জন্য জাতীয় আরকাইভস-এ সংরক্ষণ করা উচিত। এজন্য বর্তমানে সচিবালয় নথি সংরক্ষণাগারে রক্ষিত নথি সমূহের প্রশাসনিক কাজ শেষ হয়ে গেলে ঐ নথিসমূহের অনুলিপি স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য জাতীয় আরকাইভসে প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া জাতীয় আরকাইভসের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য আরকাইভস নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

(ঙ) নথি বিনষ্ট করণ পদ্ধতিঃ বর্তমান উন্নত দেশসমূহ প্রচলিত অপসারণ তালিকা পদ্ধতি (Disposal Sichedule System) অথবা (খ) দ্বি–স্তর মুল্যায়ন পদ্ধতি (Two Stage Review System) মধ্যে ভারত ও যুক্তরাজ্যে প্রচলিত শেষোক্ত পদ্ধতিটি আমাদের দেশে চালু করা যেতে পারে।

উপসংহার

৬.১. সর্বোপরি একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনস্বীকার্য। প্রশাসন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সৃষ্ট নথি পত্রাদি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। এজন্য দেশ তথা জাতীয় স্বার্থে আমাদের একটি সুষ্ঠু সুন্দর নথি ব্যবস্থাপনার কোন বিকল্প নেই। তাই নথি ব্যবস্থাপনায় জ্ঞান লাভের জন্য প্রশাসনিক ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্যাদি, দপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থাগুলোর ধতরাবাহিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন ও কর্মধারার বিকাশ সম্বন্ধে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্বিশেষে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসাবে উপরোক্ত নিয়মাবলীর মৌলিক দিকগুলো জানা থাকলে দৈনন্দিন অফিস ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়ন ও দাপ্তরিক কার্যাদি নিষ্পত্তি ও সম্পাদন সহজ হবে বলে বিশ্বাস।

পুস্তক নির্দেশিকা

১। খোন্দকার মাহবুবুল করিম, আরকাইভ প্রশাসন, ১৯৮০।

২। লো-ইন্টিস এবং ওয়েন রাইট (সম্পাদিত), গভর্ণমেন্ট আরকাইভস ইন সাউথ এশিয়া, ১৯৬৯।

৩। বোর্ড অব এক্সিকিউটিভস, বেংগল, বেংগল রেকর্ড ম্যানুয়েল, ১৯৪৩।

৪। বাংলাদেশ সরকার, সচিবালয় নির্দেশমালা-১৯৮৭।

৫। নাসিম আঞ্জুমা, অফিস্যবস্থাপনা, ১৯৮৭।

৬। পেয়ার আহমেদ চৌধুরী, অফিস্যবস্থাপনা, ১৯৮৬।

৭। শামেস মার্ক, অফিসপ্রসিডিউর এন্ড ম্যানেজমেন্ট, ১৯৮৫।

৮। এন্ডারসন, এ, অফিস ম্যানেজমেন্ট, ১৯৮৩।

৯। এম, এম, আল-ফারুক, সরকারী অফিস ব্যবস্থাপনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ, ১৯৮৯।